لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِن
كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ
النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ
قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي
أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ
اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

(১৯৮) তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশ'আরে-হারামের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হয়েছে— আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। (১৯৯) অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২০০) আর অতঃপর যখন হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে, ববং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে— হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখে-রাতও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) আর স্মরণ কর আল্লাহ্‌কে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দু' দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তার উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে হজ্ব সংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদিগকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন ; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'নেফাক' বা কপটতা ও 'এখলাছ' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুস্তাদরাকে হাকেম, ইবনে-জরীর, মুসনাদে ইবনে আবী-হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহী, সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রাঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, —হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদিগকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাযী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রুমী নিরাপদে রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রসূল (সাঃ) দু'বার এরশাদ করলেনঃ—

ربح البيع ابا يحيى - ربح البيع ابا يحيى

'হে আবু ইয়াহ্ইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।'

কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।— (মাযহারী)

পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বেদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের মাংস ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর আমল শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুসলমান

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى
فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ
لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَ
اللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ
بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ
ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۗ
وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾ سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ
اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্‌কে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্‌ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৭) আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ্‌ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২০৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না—নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০) তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ্‌ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সব কার্য-কলাপই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছবে। (২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত স্পষ্ট নির্দশনাবলী দান করেছি। আর আল্লাহ্‌র নেয়ামত পৌঁছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহ্‌র আযাব অতি কঠিন।

শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে উটের মাংস ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তে তা ভক্ষণ করা ফরয নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের মাংসকে হালাল জেনেও কার্যতঃ তা বর্জন করি, তা'হলে তো দু'কূলই রক্ষা পায় —মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইলো, অথচ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহ্‌র অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশী বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসাবে পালন করা না হবে; যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এমনসব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হোল একটি শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসাবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً - سلم শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্‌ম ও সাল্‌ম) দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে শান্তি' অপরটি ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। -(ইবনে কাসীর) كَآفَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে' এবং সাধারণভাবে এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে ادْخُلُوْا (তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে سلم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে,— তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিস্ক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিস্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে,— তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে,— ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ-তা মানবজীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ۭ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ
لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۭ مَسَّتْهُمُ
الْبَاْسَاۗءُ وَالضَّرَّاۗءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْـَٔـلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۭ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ
خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

(২১২) পার্থিব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুযী দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। (২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (২১৫) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও—যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্র জানা রয়েছে।

এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে। মূলতঃ তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা ঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং এবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ত্রুটি বেশীরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষতঃ সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ্। অন্ততঃপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) রচিত 'আদাবে মো'আশারাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ্ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্র আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কেয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, —যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্যে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।— (যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী)

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তাআলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্যে এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের

প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছে–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কোরআনে' বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক।

'কোন এককালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' —এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ 'একতা' বলতে কোন্ ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে নবী ও রসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। (১) হয় তখনকার সব মানুষ তওহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। অর্থাৎ, তওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকীদা ও তরীকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন্ যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? তফসীরকার সাহাবিগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপার। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়।— (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই একত্বের কাল তখনকার, যখন হযরত আদম (আঃ) সস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর জনগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আঃ)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মুসনাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হল দশ 'করন'। বাহ্যতঃ এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আঃ)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কোন কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে—'আমি নবী-রসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।'

এ দু'টি বাক্যে আপাত দৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ, নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোন মত-পার্থক্য ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্যে এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা যায়। ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কি ব্যবস্থা করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ 'অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন।' তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদী ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বোঝা যায় না বা বোঝতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বোঝেও শুধুমাত্র গোঁড়ামী ও জেদবশতঃ তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ

করেছে এবং নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً –এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের উপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জেদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে অসংখ্য নবী-রসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল 'মিল্লাতে-ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী- রসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী -রসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যেই তাঁর পরে নবুওয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খত্মে-নবুওয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَّمِنكُم مُّؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরশাদ হয়েছেঃ যে كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করতে থাকা।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশ্ত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে; এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা—যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। এক হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

"সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তাআলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়তের খেলাফ নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্র আদেশের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জান-মাল কোরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জান-মাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন- যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রসূল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং

সেগুলোর উত্তর রসূল (সাঃ)–এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কোরআন শরীফে রয়েছেঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ — এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তাআলা ফতোয়া দেয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রসূল (সাঃ) দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূতে শরীয়তের যেসব হুকুম–আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাক্বারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে–কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা–হা ও সূরা নাযেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল—যার উত্তর কোরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। মুফাসসের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুযুরে আকরাম (সাঃ)–এর প্রতি তাঁদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন করীমে দেয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। — (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবিগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ অর্থাৎ, মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দু'টি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে।

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লেখিত আয়াতে দেয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেয়া হয়েছে। এজন্য বোঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে—নুযুল হচ্ছে এই যে, আমর ইবনে নূহ রসূল (সাঃ)–কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে ما ننفق من اموالنا واين نضعها অর্থাৎ, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জরীরের বর্ণনামতে এ প্রশ্নটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ–সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা?

দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে–নুযুল ইবনে হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রসূল (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শোনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করব? এখানে এ প্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ, কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব'—এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা যা–ই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে— তোমাদের পিতা–মাতা, নিকট আত্মীয়–স্বজন, এতীম–মিসকীন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ, কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে' তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তাআলা জানেন।' বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যাকিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করবো? এর উত্তরে বলা হয়েছে قُلِ الْعَفْوَ 'আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্র পছন্দ নয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ
كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ
اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ
مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয় তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয় তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না! (২১৭) সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ! আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতেকরে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্র পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২১৯) তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ- গুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জেহাদের কয়েকটি বিধান ঃ উল্লেখিত আয়াতের প্রথমটিতে জেহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হোল।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জেহাদ করা ফরয। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জেহাদের এ ফরয, ফরযে-আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জেহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

الجهاد ماض الى يوم القيامة —এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জেহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তাআলা জান এবং মালের দ্বারা জেহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।'

এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্ তাআলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জেহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

অর্থাৎ, 'কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে বেরিয়ে গেলো না।' এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জেহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীমদানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে ফরযে-কেফায়া হবে।

তাছাড়া বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বললো, জি, বেঁচে আছেন। তখন রসূল (সাঃ) তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জেহাদের সওয়াব হাসিল কর। এতেও বোঝা যায় যে, জেহাদ ফরযে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি

দল জেহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জেহাদ ফরযে আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কোরআন-হাকীমের সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ

— অর্থাৎ, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে আইন হয়ে যায়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মোহাদ্দেসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জেহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে- কেফায়া।

যতক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ ফরযে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জেহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জেহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জেহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে এরশাদ হয়েছে যে, – 'যদিও জেহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে ঃ "জেহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ. উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।"

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলী ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্ব এবং মহররম মাসে যুদ্ধ – বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা ঃ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ أربعة حرم ثلاث متواليات ورجب বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে হুযুর (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লেখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী-রাবাহ্ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহ্‌গণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً আয়াতটি উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াত হচ্ছে ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

حيث শব্দটি এ স্থলে কাল বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত) পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রসূল (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশআরীকে' আওতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ্‌গণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রূহুল-মা'আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরা বরা'আতের প্রথম রুকূর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'এজমায়ে উম্মতের' কথা উল্লেখ করেছেন।— (বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু তফসীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, 'আয়াতুস সাইফ'। অর্থাৎ,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

পরন্তু এ আয়াতটি জেহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূর (সাঃ)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্বের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রসূল (সাঃ)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লেখিত আয়াতকে মনসুখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ এব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফেররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের

জন্যেও বৈধ্য হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকুকেই রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে— اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যেও জায়েয। যেমন, ইমাম জাস্সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম ঃ উল্লেখিত আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে। حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, 'তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্যে বরবাদ হয়ে গেছে।' এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায- রোযা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাসআলা ঃ যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ্ব করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায-রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয়বার হজ্বকে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামায-রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্যে কাফেরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

সাহাবিগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবিগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু'টির তাৎপর্য ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান ঃ ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের পরেও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তাঁরা যান না। এ ব্যাপারে নবী-করীম (সাঃ)-এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবিগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকা কালেও মদ্য পান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

মদীনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারূকে-আযম, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রসূলে-করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ "মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দ্বীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্যে পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনা নিম্নরূপঃ একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সাহাবিগণের মধ্যে হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি

মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরী বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। এরশাদ হলঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের-কাছেও যেও না।' এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বিরত করে। যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্যে মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওক্কাসও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেনঃ

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।' তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে; আর আল্লাহ্র যিকর ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ ঃ আল্লাহ্ নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে— لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে।' এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি। বরং এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নেসায় বলা হয়েছেঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ —এতে বিশেষভাবে নামাযের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্যে অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সূরা মায়েদায়। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন, 'যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর।' এজন্যে ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্যে রসূল (সাঃ) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছে-'সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।'

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে,— 'শরাব এবং

ঈমান একত্রিত হতে পারে না।' তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হুযুর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সাঃ) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্যে আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি, বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবিগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ ঃ আদেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবিগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্যে রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রসূলে-করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্য পান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) তখন এক মজলিসে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রাঃ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে—হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হল যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্যে রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবিগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন।

হুযুর (সাঃ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবিগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছল, তখন সে সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল- যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুযুরে-আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সাঃ) হুকুম করলেন—মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জেযা এবং সাহাবিগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণ হল। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীমের (সাঃ) একটিমাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তাঁরা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য ঃ আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু'জেযা বা নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরবদেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘন্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশপাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল।

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নত মানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্যে জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা হল। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে, তা হল এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি?

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি। বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, এবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রসূল (সাঃ)-এর একটিমাত্র আহবানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরীর কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরী হয়ে গেল।

তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরকিার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সবকিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃংঙ্খলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা ঃ এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান—কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশী। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফেকাহ্‌র কয়েকটি মূলনীতি বর্ণণা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে-শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন,—যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হাল্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানিগণের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎস্যবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে গুরুতর। সুতরাং কোরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

অর্থাৎ, 'শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।'

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়; যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা, তার কাজ ও চাল-চলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন এবাদত অথবা আল্লাহ্‌র কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে— শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ্ স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রসূল (সাঃ) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন — ام الفواحش وام الخبائث অর্থাৎ, 'শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।— (তফসীরে আল-মানার ঃ মুফতী আবদুহু-পৃঃ ২২৬, জিলদ ২)

আল্লামা তানতাবী (রাহঃ) আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম'-এ লিখেছেন,—'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভবে প্রভাবিত হয়নি'; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যাণ্টাম লেখেন,—'ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হত শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রির লোকদের জন্যে যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোন সৎলোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহল—ধ্বংসের উপকরণ! এই 'উম্মুল-খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো না; ফিরে এসো فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কোরআনের চারটি আয়ত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহ্লের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।

তফসীর ও ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ্ তাআলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نُسْقِيكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরী করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দুরকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। একটি হল নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরীর কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলীল দেয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তাআলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র নেয়ামত। যথা, সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহ্র নেয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন,—কোন্ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্ পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ্ তাআলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীতে 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসের নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুকর' (سكر) বলেছেন।— (রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস)

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।— (জাস্সসা ও কুরতুবী)

জুয়ার অবৈধতা ঃ ميسر একটি ধাতু। এর অভিধানিক অর্থ বন্টন করা। ياسر বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্ট করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেতা আবার কউে বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হতো; নিজেরা ব্যবহার করতো না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে এবং জাস্‌সাস 'আহকামুল-কোরআনে' লিখেছেন যে, মুফাস্‌সেরে কোরআন হযরত ইবনে-আব্বাস, ইবনে ওমর, কাতাদা, মোআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রাঃ) বলেছেন ঃ

'সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।' ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ من القمار المخاطرة লটারীও জুয়ারই অর্ন্তভুক্ত।' জাস্‌সাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন ঃ 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর অন্তর্ভুক্ত।'—(রূহুল-বয়ান)

مخاطرة 'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে।- (শামী পৃঃ ৩৫৫, ৫ম খণ্ড)

উদাহরণতঃ এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়— যেমন, যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। আর এতে যদি কোন চাঁদা নেয়া না হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমণশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত।

এ জন্য সহীহ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাওহারাম।

মুসলিম শরীফে বারীদা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে-আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন যে,— দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ।— (ইবনে-কাসীর)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রূমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযত আবু বকর (রাঃ) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রসূল (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযূর (সাঃ) ঘটনা শুনে খুশী হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ্ তাআলা সেগুলো হালাল থাকাকালেও স্বীয় রসূল (সাঃ)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হয়রত জিবরাঈল (আঃ) রসূল (সাঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রাঃ)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয়। হুযূর (সাঃ) জাফর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ্ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভাল-মন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি কোন দিন মূর্তিপূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোন দিনও মিথ্যা কথা বলিনি।- (রূহুল-বয়ান)

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি ঃ জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশী। এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং

অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমণশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত-পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা, এতে উভয়পক্ষের লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মাইসির' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ, দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে, অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ায় বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘোষণা করেছেঃ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, সম্পদ বন্টন করার যে নিয়ম কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মত পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

অর্থাৎ, শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম ঃ এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যার ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা অষুধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশী, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী, শরীয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যেনা-প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা, কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এর ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে তারাই বেশী লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

ফিকাহর আর একটি আইন ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোন একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে।

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ
لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ
يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾ وَ
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي
الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ
مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۗ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۗ
وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَ
بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ
تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

(২২০) দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞ। (২২১) আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ্ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সবকিছুই শুনেন, জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জাতিকে তাদের প্রথা-পদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রীস্টান বা নাসারা মনে করে ; অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা সম্পূর্ণ মুশরেকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহ্র অস্তিত্বও স্বীকার করে না,ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলকেও আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরেকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শেরেকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শেরেকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শেরেকে জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি জাহান্নাম ! এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ্ তাআলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন ঃ

প্রথমতঃ মুশরেক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তাই এখানে মুশরেক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শেরেকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। কারণটি তো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই খাটে, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে; তওহীদ, পরকাল ও রিসালত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আঃ)–এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শেরেক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযূর (সাঃ)–কে রসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলেও তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোন অনিয়ম বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে–ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফের না হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেছেন,–মুসলমান বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ।– (কিতাবুল–আসার, ইমাম মুহাম্মদ)

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা–প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা 'হাদীসে–দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারূকের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম–শুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খ্রীস্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিত। তারা ঈসা (আঃ)–কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ইহারাম। বিশেষত ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী–নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ
مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۗ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ
تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ
وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিল-মিশ্ করে নেয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২২৭) আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। (২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২২৯) তালাকে-'রাজঈ' হ'ল দুবার পর্যন্ত— তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা ঃ (১) চরম যৌন উত্তেজনা বশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

(২) পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ—যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) 'লাগভ্-কসম'-এর দু'টি অর্থ—একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণতঃ— নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে,— 'যায়েদ এসেছে' । কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এ রকম,— এতে কোন পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগভ্' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্যে কোন জবাবদিহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গমুস' এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবু হানিফার (রহঃ) মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লেখিত অর্থে 'লাগভ্' কসমের জন্যও কোন কাফ্ফারা নাই। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগভ'এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগভ্'(অহেতুক) এজন্যে বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোন কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গমুস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি— 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে।

(৪) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করলো না।

দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো।

তৃতীয়ত ঃ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা চতুর্থত ঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখলো। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় দিকগুলোকে 'শরীয়তে' ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনঃর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট

থাকবে।— (বয়ানুল-কোরআন)

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাপর কয়েকটি রুকূতে এ মূলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ঃ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা,যার কম-বেশী করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যেই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কোরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লেখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে,— নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ঃ ''যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে,তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।''

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান ঃ ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হোত, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্ত্বাকেই স্বীকার করতো না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে এবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হল অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয়াকে কৌলিণ্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদন্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হতো না।

'হযরত রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মদী এবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেৎনা-ফাসাদের মূল কারণঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেৎনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে—

الجاهل اما مفرط اومفرّط অর্থাৎ, "মূর্খ লোক কখনও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে।" বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যেই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেৎনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফৎনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেৎনা-ফাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রসূল (সাঃ)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাসআলা ঃ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবারও উপদেশ দেয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে অর্থাৎ, সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য ঃ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য।

উল্লেখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ "তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।" এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদা প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা, তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই مِثْلُ শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মত বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা, এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। – (বাহরে-মুহীত) এ বাক্য শেষে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, 'মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়,বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ

অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যথা বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে— وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এ আয়াতের উদ্দেশে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফেলতীও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বোঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝতে হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক ঃ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও এবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও এবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না।

প্রথমতঃ —যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ — বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরীয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে— যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'এজাব কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হল, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা এবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশী। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কোরআন ও হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে এবাদতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে — ابغض الحلال الى الله الطلاق অর্থাৎ,

"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।"

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না।

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে রাজী হয়েও নিজেরা পুনরায় বিয়ে করতে চায়, তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক - ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে এরশাদ হয়েছে - اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ অর্থাৎ, তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে — فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, হয় শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেয়া হবে, যাতে সে (স্ত্রী) মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কোরআন-মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

অর্থাৎ, "তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া হালাল নয়।'

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

(২৩০) তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। (২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্র সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়। (২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্বস্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরৎ নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি, এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরৎ নেয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েয হবে। এই মাসআলা বর্ণনা করার পর এরশাদ হয়েছে : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে-শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তিন তালাক ও তার বিধান : এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এরপর তৃতীয় তালাককে (যদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে—এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ, তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ্ তৃতীয় তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে-বেদ'য়াত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহ্গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়াও জায়েয বলেন। এসব ফকীহ্ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা, বরং বেদ'য়াত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়িগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ একে আহ্সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবিগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি-শাইবা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখ্য়ী (রাহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবিগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যায়। তবে مَرَّتٰنِ শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই

তালাক দেয়া উচিত নয়;বরং দুই তুহুরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। الطلاق طلاقان এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مَرَّتٰنِ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া।—(রুহুল-মা'আনী)

যাহোক, কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহ্গণ একে সুন্নত তরিকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ- 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক এক সাথে দিয়েছে—এ সংবাদ রসূল (সাঃ)-এর নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো— হে আল্লাহর রসূল ! আমি তাকে হত্যা করব?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন— (যাদুল-মা'আদ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহবৃন্দ তৃতীয় তালাককে নাজায়েয ও বেদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়াকে সুন্নত তরিকা বলে যদিও একে বেদ'য়াত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে,— প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারকতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে—فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবনযাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ হয়েছে। تَسْرِيْحٌ অর্থ খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ) আবু রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোরআন مَرَّتٰنِ বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক। —(রুহুল-মা'আনী) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্ম পদ্ধতিও তাই করে যা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে امساك এর সাথে بِمَعْرُوْفٍ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক। তেমনিভাবে تَسْرِيْحٌ এর সাথে احسان শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায়, তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এহ্সান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়,কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হচ্ছে—

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাত ছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর

কখনো বিয়ে হতে পারবে না।

একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন ঃ এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ- সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসূল (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে,এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুযূর (সাঃ)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ করেই একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি, জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর 'উমদাতুল-আসার' গ্রন্থে এ মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু'তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

ইতিপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনাসহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহ্কাম বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা ঃ প্রথম আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দু'জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশী বা আবেগের তাগিদে কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সাঃ)- তাঁর হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

অর্থাৎ, স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়।

কোরআনে -হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধুমাত্র আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না; বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি, সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহ্র ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না ঃ দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে এই, এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا - খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর হচ্ছে এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসাবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাস মুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে-মার্দুবিয়্যাহ্ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে, আর ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক (তিন) রাজ'য়াত বা তালাক প্রত্যাহার।"

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের এজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে - إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাজী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজীও হয় আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে إِذَا تَرَاضَوْا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে এরশাদ হয়েছে—

ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ, "এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তাআলা ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্যে এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ'— এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি ঃ কোরআন করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরী করার উদ্দেশে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ
لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ
فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ
سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

(২৩৩) আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু' বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেন রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। (২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কতর্ব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা! তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে। (২৩৫) আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমার অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাকসংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদানসংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও জুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

– অর্থাৎ, মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু' বছর স্তন্যদান করাবে যদি কোন বিশেষ অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য না করে।

এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাসআলা বোঝা গেল।

শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব ঃ প্রথমত ঃ এই যে, শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তনদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহবন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তনের দুধপান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এরশাদ হয়েছে—

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ— "নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার দায়িত্ব। কাকেও সামর্থের উর্ধ্বে কোন আদেশ দেয়া হয় না।"

এতে প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশে কোরআন-মজীদে والدات শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ وَالِدٌ কে বাদ দিয়ে الْمَوْلُوْدِ لَهٗ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ কোরআনের অন্যত্র وَالِدٌ শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ অবশ্য এক্ষেত্রে وَالِدٌ এর পরিবর্তে مَوْلُوْدٌ لَهٗ ব্যবহার করার

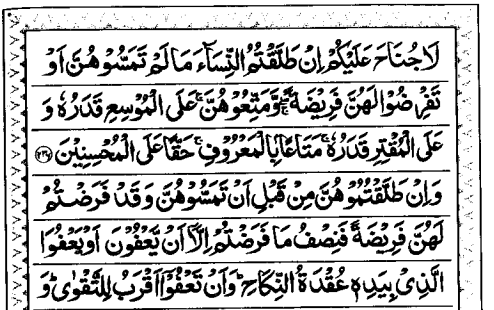

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ
عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَ
لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۚ وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

(২৩৬) স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়ছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব। (২৩৭) আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্‌র সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। (২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। (২৪০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (২৪২) এভাবেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।

একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে যে, —কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং অভিভাবক সুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমতে কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খচর বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।— (মাযহারী)

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে ঃ শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, — যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশী এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতহুল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্‌র ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে ঃ

لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

অর্থাৎ, কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। আর কোন পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না।" অর্থাৎ, শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয় আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ ঃ পঞ্চম মাসআলা لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ..... إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের

বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমে অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত। চতুর্থতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন-মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (রাঃ) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাযী শোরাইহ্ পাঁচশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়। (কুরতবী)

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছেঃ

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরবের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই নিদর্শন — যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ – এর তফসীর রসূল (সাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন। বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুকুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রাঃ) এবং ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকেও উদ্ধৃত করেছেন। (কুরতুবী)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে,বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত।

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি নামায— ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি নামায — মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মে ব্যস্ততা থাকে। আর হাদীসে 'কানেতীন বা আনুগত্যের' সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'নীরবতার সাথে'।

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয ছিল। আর এ নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে যখন একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে সেজদার ইশারা রুকূর ইশারার চেয়ে একটু বেশী নীচু করবে। চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে না। (যেমন যুদ্ধ চলাকালে) তখন নামায কাযা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় করবে। (বয়ানুল-কোরআন)

(১) জাহেলিয়াত وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ .... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে ঃ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا –কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মিরাসের বিধান নাযিল হয়নি এবং মিরাসে কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ এর তফসীরে বোঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই ওসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়েয ছিল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েয ছিল। এখানে 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়,তখন বাড়ী-ঘর এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেয়া হয়েছে, কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

(২) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেয়া। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়া। আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে-মিসাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব তালাকে-রাজয়ীই হোক আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

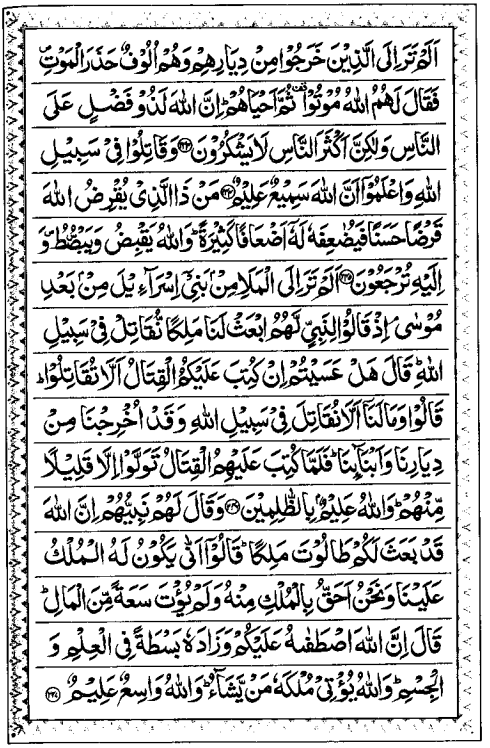

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن
دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ
الْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী! কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন। (২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ–বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ্‌ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২৪৬) মূসার পরে তুমি কি বনী–ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর–বাড়ী ও সন্তান–সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ তাআলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন,— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন,— নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জেহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত–মউত বা জীবন–মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জেহাদে অংশ নেয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে ইবনে–কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,—কোন এক শহরে বনী–ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে,—মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না—তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন–কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বদ্ধন কূপের মত করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে–গলে গেল এবং হাড়–গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আঃ) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বদ্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়–গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেনঃ

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করছেন। আল্লাহ্‌র নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহ্‌র আদেশ শ্রবণ করলো। অনেক জড়বস্তুকে হয়ত মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু–পরমাণুও আল্লাহ্‌র অনুগত ও ফরমাঁবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কোরআন করীম أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ – বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন।

মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বলঃ 'ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।'

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ দেয়া হলোঃ হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ্ তাআলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং

বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগলো سبحانك لااله الا انت "তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই"।

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জেহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন। কোরআন-মজীদ এরশাদ করেছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ —অর্থাৎ, আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল?

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযুর (সাঃ)- এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুযুর (সাঃ) - এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে اَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসেরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে اَلَمْ تَرَ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুযুর (সাঃ)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুযুর (সাঃ)-এর দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে اَلَمْ تَرَ দ্বারা اَلَمْ تَعْلَمْ (আপনি কি জানেন না?) বোঝানো হয়। তবুও اَلَمْ تَرَ শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। اَلَمْ تَرَ -র পরে اِلَى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত বোঝায়। অতঃপর কোরআন করীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ اُلُوْفٌ অর্থাৎ, সংখ্যায় ছিল তারা হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে ঃ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বললেন,— "তোমরা মরে যাও।" আল্লাহ্র এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে, কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে।

অতঃপর বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা বনী-ইসরাঈলদের উল্লেখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশে এরশাদ হয়েছে - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শত সহস্র দয়া ও করুণার নিদর্শন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জেহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রসূল (সাঃ)-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।'

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন ঃ এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হল এই যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন

করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা।

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

ইমাম বোখারী (রহঃ) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানিছেন যে, তিনি রসূল (সাঃ)-কে প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল (সাঃ) তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্যসহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুযুর (সাঃ)-এর বাণী- 'প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'— এর ব্যাখ্যাও তাই।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এটা একান্তই আল্লাহ্‌র কুদরত যে, সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহ্‌র অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) যার সমগ্র ইসলামী জীবনই জেহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জেহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 'আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ্ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জেহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।'

يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا – করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ্ তাআলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী হবে।

আল্লাহ্‌কে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

(১) "কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদ্‌কা করার সমতুল্য।"

(২) ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব্ অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে; আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন— আবুদ দারদাহ্ (রাঃ) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দারদাহ্ রসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,— হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহ্ তাআলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই! আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এর বদলে তোমাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দারদাহ্ একথা শুনে বললেন,— হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ), হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়লেন। আবুদ দারদাহ্ বলতে লাগলেন— 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্‌কে ঋণ দিলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, একটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। আবুদ দারদাহ্ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম— যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বললেন, এর বদলে আল্লাহ্ তোমাকে বেহেশত দান করবেন।

আবুদ্‌দারদাহ্ (রাঃ) বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ 'খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদ্‌দারদাহ্‌র জন্য তৈরী হয়েছে।'

(৩) ঋণ দেয়ার বেলায় তা ফেরত দেয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেয়ার কোন শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশী দিয়ে দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।'

তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ
اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا
بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا
يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

(২৪৮) বনী-ইসরাঈলীদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্ত। আর তাতে থাকবে মূসা, হারূন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়! আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ— আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্র হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ্ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। (২৫২) এগুলো হলো আল্লাহ্র নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

সে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহ্র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমালেকার কাফিরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোধনের চিন্তা হলো। এখানে যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি 'শামঈল' নামে পরিচিত। أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ – বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী-ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখতো, আল্লাহ্ তাআলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত বনী-ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বনী-ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করলো এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম।

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ – এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্যসংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদেরকে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বেশী প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারীগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেলো। রূহুল-মা'আনীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টতার কথাও চিন্তা করেননি।

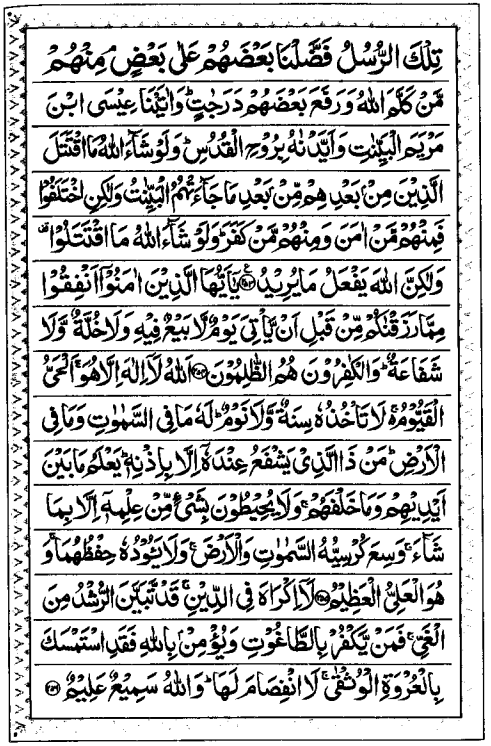

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوا
فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاۤءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا
وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اَنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُونَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ اَللَّهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ
الْقَيُّومُ ۚ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا
شَاۤءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۙ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

(২৫৩) এই রসূলগণ— আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু'জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রূহুল-কুদ্দুস' অর্থাৎ, জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যাকিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) আয়াত تِلْكَ الرُّسُلُ – এর বক্তব্যে নবী করীম (সাঃ)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁর নবুওয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ, যা وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফেররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেকে বিরুদ্ধাচারণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহ্র বহু তাৎপর্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

(২) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে; আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবিগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র নবিগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।' তিনি আরো বলেছেন— 'আমাকে মূসা (আঃ)-এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না।' আরো উক্ত হয়েছে, 'আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম।'

(৩) مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ – হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেই আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ – (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়)-আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ)- এর সাথে আল্লাহ্র কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

এ সূরায় এবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎকাজের মধ্যে জান-মাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহ্র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তা' ছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হল যাবতীয় এবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ —শীর্ষক আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত – مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ —এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে ..... أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم – অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক এবাদত ও মোমালাত নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকুতেও বেশীর ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ্ নিজে না ছাড়বেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত ঃ এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহ্‌মদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূল (সাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল-কুরসী। রসূল (সাঃ) তা সমর্থন করে বললেন— হে আবুল মান্‌যার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— 'যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।' অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা- শানুহুর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য—

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এতে 'আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত। لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা এবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ্' সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আরবী ভাষায় حى অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قيوم শব্দ কেয়াম শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থ ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়ুম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণ যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়ুম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আবদুল কাইয়ুম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়ুম' বলে তারা গোনাহগার হবে।

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের মধ্যে حى وقيوم অনেকের মতে 'ইসমে-আযম।' হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রসূল (সাঃ)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সেজদায় পড়ে يا حى يا قيوم বলছেন।

তৃতীয় বাক্য لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ – سِنَة সীন-এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نَوْم পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়ুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমিনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لام অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ এবং যমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য— مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য

সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে 'মাকামে-মাহমুদ' বলা হয়, যা হুযূর (সাঃ)-এর জন্য খাস। অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা অগ্রপশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ অর্থাৎ, মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য — وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ, তাঁর কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমিন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ্ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমিনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমিনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ।

নবম বাক্য وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমিনের হেফাযত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তাআলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।- (বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জেহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জেহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ এরশাদ করেছেনঃ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ "তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এজন্য আল্লাহ্ তাআলা জেহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জেহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জেহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য-পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জেহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল
আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ
জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জেহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ কেতালের নির্দেশ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতের পরিপন্থী নয়।— (মাযহারী)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا
اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ
هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ
اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ ۚ وَانْظُرْ اِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। (২৫৯) তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে—সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল—আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ২৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন কাফের ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, যদি আল্লাহ্ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়! যেমন, মানুষ এ মু'জেযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।— (বয়ানুল-কোরআন)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً
مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ
وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُوا
مَنًّا وَّلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَّتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ۝

(২৬০) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। (২৬১) যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবনদান প্রত্যক্ষীকরণ ঃ এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্খা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই? ইবরাহীম (আঃ) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়টা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃতব্যক্তিকে জীবিতকরণ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে!

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখী ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।

তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে ইবনুল-মান্যারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করলেন-হে ইবরাহীম! কেয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেব। কোরআনের ভাষায় يَأْتِينَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখী দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও

অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরেকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়। আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে আবার এর রেণু-কণা, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত রেণু-কণা একত্রিত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্বও সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন।

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা, বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'এতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই এতমিনান লাভের উদ্দেশেই ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও এতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রসূল (সাঃ)-এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'এতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের এতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। এতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ, তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটি দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

(এক) তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না।

(দুই) পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণতঃ কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারকতা প্রকাশ করার জন্যে বললেন ঃ দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর। ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশে বললেন أَوَلَمْ تُؤْمِنْ যাতে ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে بَلَىٰ হাঁ, বিশ্বাস করি' বলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে 'ঈমান-বিল-গায়েব' তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন হয়।

এটি সূরা বাক্বারার ৩৬ তম রুকূ, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনও এ সূরার পাঁচটি রুকূ বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকূতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকূতে ২৬২ তম আয়াত থেকে ২৮৩ তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্যে ব্যয় করার শিক্ষা,— একে সদকা ও খয়রাত বলা হয়।

(২) সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু'রুকূতে দান – খয়রাতের ফযীলত, তৎপ্রতি উৎসাহদান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু'রুকূতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকূতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
تَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن
نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

(২৬৫) যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। (২৬৬) তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। (২৬৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশে তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।

করাকে কোরআন পাক কোথাও انفاق শব্দে, কোথাও اطعام শব্দে, কোথা صدقه শব্দে এবং কোথাও إِيتَاءِ الزَّكٰوةِ শব্দে ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, انفاق- صدقه- اطعام প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-খয়রাত ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, ওয়াজিব, কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্যে কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ إِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ব্যবহার করেছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকূতে বেশীর ভাগ انفاق শব্দ এবং কোথাও صدقه শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত ঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, —অর্থাৎ, হজ্ব, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও এতীমদের জন্যে কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে।

সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ কিন্তু কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটির যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ, একটি দানাও উৎপন্ন হবে না,কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না।

(২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্যে ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয়

করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফজীলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার জন্যে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ, তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ অর্থাৎ, সদকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় যাচ্ঞাকারীর জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেয়া এবং যাচ্ঞকারী অশোভন আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয়ঃ সে দান খয়রাতের চাইতে যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যেই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে নিজের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে—লোকদেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্বাসী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশে কোন দান-খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ যোগ করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশে কাজ করা আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোকদেখানো কাজ করা বিশ্বাসে ত্রুটিরই লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্যেই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হাল্কা বারিবর্ষণই যার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎনিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক সাফল্যের কারণ।

ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তাআলা এমনিভাবে তোমাদের জন্যে নজীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ, সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক, ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্যে যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগলো, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদ্‌কা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই ব্যয় করতে হবে ; নাম-যশের উদ্দেশে নয়।

এখন সমগ্র রুকুর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও সদকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে— নাম-যশের জন্যে নয়।

দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক যাতে নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াক্‌ফ করে দেয়া সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণতঃ এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎকাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। যদি কেউ অবৈধ খেলাধূলার জন্যে স্বীয় সহায় সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়— এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী রুকূতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকূর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا ..... غَنِيٌّ حَمِيدٌ

শানে-নুযূল দৃষ্টে طيب শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্যে নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যে, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে। مَا كَسَبْتُمْ এবং أَخْرَجْنَا শব্দ, দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিষ ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মূলতঃই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সাঃ) বলেন,— তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পুতঃপবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর।— (কুরতুবী)

শষ্য ক্ষেত্রের ওশর-বিধি ঃ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ বাক্যে أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে যমীনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেন যে, ওশরী জমীতে ফসল অল্প হোক বা বেশী হোক ওশর দেয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক এবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—যাকাত। একারণেই ওশরকে 'যাকাতুল -'আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ শুধু করকে বোঝায়। এতে এবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা এবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অ-মুসলিমরা এবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যতঃ আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রির উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়,কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ..... وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তাআলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি— প্ররোচনা ও নির্দেশ নেয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদ্‌কা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝٢٧٠
اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ
تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٧١ لَيْسَ
عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا
ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝٢٧٢ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۖ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ
لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝٢٧٣ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٢٧٤

(২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ্ তআলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে – জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচ্ঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ 'হেকমত' শব্দটি কোরআন পাকে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীর বাহ্রে-মুহীতে তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র। احكام শব্দটি حكمة এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা।

এ কারণেই বাহ্রে-মুহীতে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ – হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুওয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুওয়তকে বোঝান হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন ঃ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্র জন্যে ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়াদির পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিষ্কার। অন্যের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম।

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্যকথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহ্র ভয়। শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে رأس الحكمة خشية الله অর্থাৎ, আল্লাহ্র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে— তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য يُؤْتَى الْحِكْمَةَ উআয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে।— (বাহ্রে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খন্ড)

এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক। وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا বাক্য থেকেও এ দিকেই ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকমত দেয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেয়া হয়েছে।

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ..... وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানো ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণতঃ আর্থিক এবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক এবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না হোক, ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার

মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনান হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছে।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ..... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ গোপনে দান করার সাথেই গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারাও সম্পর্কযুক্ত নয়— শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্যে গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ ..... وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধুমাত্র মুসলমানকেই দেবে— কাফেরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেয়া দরকার যে, এ সদ্‌কা অর্থ নফল সদ্‌কা, যা যিম্মী কাফেরকেও দেয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেয়া জায়েয নয়।— (মাযহারী)

মাসআলা ঃ দারুল-হরবের কাফেরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেয়া জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ যিম্মী কাফের অর্থাৎ, যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও ওশর দান করা জায়েয নয়, অন্যান্য সব ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝান হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দুরস্ত হবে।— (কুরতুবী)

تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।—(কুরতুবী)

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না— এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না। لانهم متعففون عن المسألة عفة تامة কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে।— (কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার দশ হাজার দেরহাম দিনে, দশ হাজার দেরহাম রাত্রে, দশ হাজার দেরহাম গোপনে ও দশ হাজার দেরহাম প্রকাশ্যে, এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দেরহাম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নুযুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

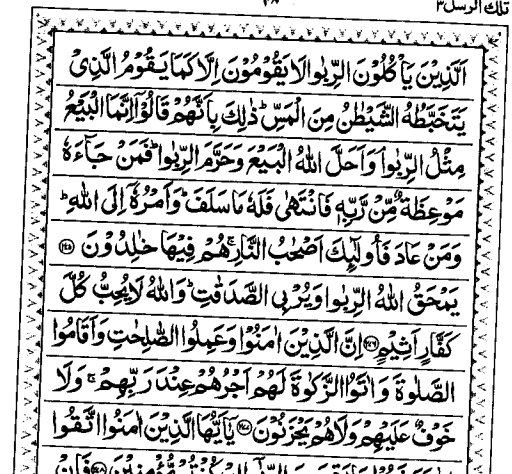

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا
اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ
لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ
إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

(২৭৫) যারা সূদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সূদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সূদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ্ তাআলা সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'রিবা' অর্থাৎ সূদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েকদিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সূদের কারণে কোরআন ও সুন্নায় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সূদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সূদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ্ হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সূদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সূদ কোন্ কোন্ ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান?

সূদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ, বাস্তবিকই কি সূদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিস্কসমূহের উদ্ভট ফসল? নতুবা সূদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সূদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সূদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ?

এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সূদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সূদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সূদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সূদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যেম জওযী (রহঃ) লিখেছেনঃ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূদখোরেরা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উত্থিত হবে— কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামী ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, শয়তান আসর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না; তারা শয়তান

কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে।

সম্ভবতঃ এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশতঃ অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। এমনি হবে সুদখোরদের অবস্থা।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে কি না? আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উত্থিত করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায়ও অজ্ঞানই ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায়ই উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠানো হবে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ-গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরৎ দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরৎ দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই।

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দু'টি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ "ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।" অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে?

এ জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ, মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেন-দেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তাআলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাআলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে— সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা নাই করুক। কেননা, সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয়, কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্যে তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্যে তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তওবা করেছে— তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

মনে প্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহ্র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্ হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ, সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেয়া হয়। এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তাআলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও

উপকারিতা বেড়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তিলাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন ঃ সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা-বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, তা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন না কোন বিপর্যের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (রহঃ) বলেন ঃ আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার উপায়, যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সন্তান সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ বর্ধিষ্ণুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুর বার্তাবহ। এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ, আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশী। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাব-পত্রেরও তাদের অভাব নেই। নফর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রি হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না বরং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত, যা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্যে মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাব-পত্র সুদৃশ্য ও মনোরম করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়, কিন্তু এতসব সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি সুখ নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবে,— যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বড়ি ব্যবহার না করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বড়িও তাদের ঘুম আনতে ব্যর্থ হয়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন, কিন্তু ঘুম কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তাই।

বিষয়টি বুঝে নেয়ার পর সুদ-খোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন, কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে, ভিন্‌দেশ থেকে জাহাজ আসে— এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়।

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন তাদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। বলাবাহুল্য, সুদখোরেরা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইযযত ও সম্ভ্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্যে যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ

এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফলশ্রুতি। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবতঃ কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমতঃ তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপ ঃ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজে দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লায়ই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে ঐসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদম খোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটা-তাজা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে।

এর বিপরীতে দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদেরকে কখনও ধন-সম্পদের পেছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জামওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থৈর্য তারা অনেকগুণ বেশী ভোগ করে থাকেন। লাবাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ —মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার ; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হুযূর (সাঃ)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই ঃ "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা।"— (মুসনদে-আহমদ, ইবনে-মাজাহ্)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা কোন কাফের গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।" এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার, পাপাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মুমিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, সেগুলোর লেনদেনও হারাম।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বনীছকীফ ও বনী-মখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আর এদিকে বনী-ছকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী-মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররমা। তখন মক্কা বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মুআয (রাঃ)। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব ইবনে-উসায়েদ (রাঃ)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশে ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট লিখে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে।

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অঙ্ক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অঙ্ক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে اتَّقُوا اللّٰهَ এবং নির্দেশের পরে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কোরআন পাকে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে—

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে।

এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পূতঃপবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

– অর্থাৎ, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয়— ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্যে আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অঙ্ক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়।

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তাআলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদ্‌কা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্যে সদ্‌কা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেন ঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম।

সূরা আলে-এমরানের ১৩শ রুকূর ১৩০ তম আয়াতটি এই ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ চতুর্গুণ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।"

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহেলিয়াত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে সুদের উপর বাকী দেয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন্নুকূল' গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লেখিত আছে।

জাহেলিয়াত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (অর্থাৎ, কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাক্বারা ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে; কয়েকগুণ বেশী হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছেঃ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا অর্থাৎ, আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করো না। এতে 'অল্পমূল্য' বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্পমূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, বেশী মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি তাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

'রিবার' আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও সুন্নায় যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝানো হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্ততঃ করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ কোরআন ও সুন্নায় 'রিবার' স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি?

দ্বিতীয়তঃ রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য ও উপযোগিতা কি?

তৃতীয়তঃ সুদ বা 'রিবা' যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে?

রিবা শব্দের ব্যাখ্যাঃ একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর ঃ 'রিবা' আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেন-দেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'রিবা' শব্দ এবং এর লেন-দেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেন-দেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মূসা (আঃ)-এর উম্মতের জন্যেও সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে।

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা 'রিবার' অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কেরাম 'রিবা' শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন তাঁরা তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার

বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার যাবতীয় লেন-দেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, দেশের আইন হিসেবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দেন যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারূকে আযমের (রাঃ) মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন; প্রচলিত রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও করেননি।

তফসীরবিদ ইবনে-জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ ''জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা।'' আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হতো।— (তফসীরে ইবনে-জরীর, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ।)

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান গারনাতী রচিত 'তফসীরে-বাহ্‌রে মুহীতে' ও জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এ রূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেয়াও তদ্রূপ জায়েয হওয়া উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ كل قرض جر نفعا فهو ربا অর্থাৎ, যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তা'ই রিবা।— (জামে'-সগীর)

তবে নবী করীম (সাঃ) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণতঃ তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং নগদে হওয়া দরকার। কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর।

আরবে 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' নামে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার প্রচলিত ছিল। বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য যথা— গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা – গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলা হয়।

সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।— (ইবনে-কাসীর)

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে? হযরত ফারূকে-আযম (রাঃ) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন যে,

'সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত।— (আহ্‌কামুল-কোরআন-জাস্‌সাস, ইবনে-কাসীর)

ফারূকে-আযম (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ঐসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহেলিয়াত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল 'রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কেরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারূক আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রধান্য বিস্তারের মোহে মোহগ্রস্ত, তারা ফারূকে-আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, 'রিবা'র অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। 'আহ্‌কামুল কোরআনে ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারূকের-আযমের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ "যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছেন, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বোঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলকে একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্যে তাদেরই ভাষায় তা অবতীর্ণ করেছেন। তাদের ভাষায় 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী তফসীর-কবীরে বলেন ঃ রিবা দু'রকম ঃ (এক) বাকী বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেন-দেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত।

জাসসাসের আহকামুল-কোরআনে বলা হয়েছেঃ রিবা দু'রকমঃ একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহেলিয়াত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-রুশদ 'বেদায়াতুল-মুজতাহিদ' গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম তোয়াহাবী 'শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা ঋণের উপর নেয়া হতো। জাহেলিয়াত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা

যায়, যা বিশেষ প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা কিংবা বাকী দেয়ার পরিবর্তে নেয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্নিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকাহ্‌বিদরা পরস্পর মতভেদ করেন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ' গ্রন্থে বলেন ঃ এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশী নেয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলতে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয়। অর্থাৎ, কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاربا إلا فى النسيئة অর্থাৎ, রিবা বা সুদ শুধু বাকী দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকী দিয়ে মুনাফা নেয়াকেই বলা হয়। এ ছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও বেশী হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতয়ি প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচল নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহ্‌য় সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা ঃ এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহ্‌র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

'রিবা' অর্থাৎ, সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্যে ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে! এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়—তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই লক্ষ্য করে না—যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্যে একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুক? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না।

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী, অবাস্তব চিন্তা-ধারার সেকেলে লোক বলেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়, বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়, বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না, তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মান্যকারী কে ছিল? সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে

সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয় বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্টক্ষত, যা অহরহ তাকে খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব বিচক্ষণদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটি কতক পুঁজিপতি সমগ্র জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্যে আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেলো এবং দেখালো যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ।

কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বলবে ঃ তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের কল্যাণ এদের মহল্লায় নয়— অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ। দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত, গোশত খেয়ে এ হিংস্ররা তাজা হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হবে আর কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্পীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্ট ঃ সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়— এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবুও এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও আধুনিক পদ্ধতি এমন বিশ্রী যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে—যাতে এদের আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্যে ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে— যাকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধুলি দেয়ার জন্যে বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতিরই উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজের টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না, কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাঙ্ক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং পতিতালয়গুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে,বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্রবিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতিতে-শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্যে এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্দ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্যে কোন মজুরী কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমতঃ তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাঙ্কে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাঙ্ক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশ গুণ বেশী টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশ গুণ বেশী দিয়ে দেবে। এক লক্ষ দূরের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যেও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পু'জিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির প্রতি এটা কতবড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা বখশিস হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

এর চাইতেও বড় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পড়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্যে যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির

পুঁজি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সবাই বক্তিগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেতো। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়তো। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। অথচ বর্তমান এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাঙ্ক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাঙ্ক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যখনই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতিই জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো।

সুদের আরো একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন সে পুনরায় মাথা তোলার যোগ্য থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরদাস্ত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, তদুপরি ব্যাঙ্কের ঋণও চেপে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না— ঋণী হয়।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল ঃ

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয়।

সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি اَلرِّبٰوا অক্ষরে অক্ষরে সত্য; অর্থাৎ, মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা, অপরটি 'স্টক-এক্সচেঞ্জ'। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুর্বিপাক; যথা, জাহাজ ডুবি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নীচে নেমে আসা। বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়— জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশী হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাঙ্কের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তা উদ্ধার করে নেয়া হয়।

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত, দুঃস্থ ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়। অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায়।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্যই গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হাঁ, গুটিকতক ধনীর ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংসে এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনর আনা করা হয়েছে – যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্যে সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যেন শত্রুকে ভিতরে রেখেই দরজা এঁটে দেয়ার মত হয়ে গেছে।

যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয় এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ এস্থানে প্রশ্ন উঠতে হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু না কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে বৃহৎ পুঁজিপতিরা এরদ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছে তবে হাঁ, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের মতই হবে, অর্থাৎ, জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে ভূগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক

পুঁজিকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নীচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় ঃ এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমানুয়ে হ্রাসই পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্যে সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার- প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে; বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষই উপকৃত হবে।

(১) মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা। অর্থাৎ, নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

(২) সুদখোরেরা কোন বিদপগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

(৩) সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? ঃ সুদের স্বরূপ এর বৈষয়িক, পার্থিব ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা। বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পীতল্পা গুটানো।

এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা একান্ত প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলে নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম, ও উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামে পূর্ব থেকেই যাকাতও ওয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতেরও ধারে কাছে যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি – তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌছে দিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌছে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে,তবে কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাব গ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্হ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ
لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

(২৮২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু' জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু' জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার, দশ জনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

অর্থাৎ, 'তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও'।

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধানকাটার সময়' নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ, এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে— যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্‌কা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে

শ্রেণীকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নীচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় ঃ এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমানুয়ে হ্রাসই পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্যে সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার- প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে; বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষই উপকৃত হবে।

(১) মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা। অর্থাৎ, নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

(২) সুদখোরেরা কোন বিদপগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

(৩) সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? ঃ সুদের স্বরূপ এর বৈষয়িক, পার্থিব ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা। বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পীতল্পা গুটানো।

এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা একান্ত প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলে নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল ; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম, ও উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামে পূর্ব থেকেই যাকাতও ওয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতেরও ধারে কাছে যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি – তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছে দিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে,তবে কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাব গ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্হ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۭ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاۗءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۭ وَ
لَا يَاْبَ الشُّهَدَاۗءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۭ وَلَا تَسْـَٔـــُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ۭ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۠ وَلَا يُضَاۗرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ۭ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۭ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٢٨٢

(২৮২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু' জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু' জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার, দশ জনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

অর্থাৎ, 'তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও'।

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধানকাটার সময়' নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে 'ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না,তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ অর্থাৎ, এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে— যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্কা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে

وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ অর্থাৎ, যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশীর সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলা হয়েছেঃ

وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا অর্থাৎ, সে তার পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মূক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মূক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কোরআন পাকের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি ঃ এ পর্যন্ত লেন-দেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে— যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষীর সংখ্যা ঃ এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্যে যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী ঃ (২) সাক্ষী মুসলমান হতে হবে। مِنْ رِّجَالِكُمْ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ, পাপাচারী) হলে চলবে না। مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ্ ঃ

নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্যে ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক—সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয়—বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয়পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতি ঃ আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছেঃ

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অর্থাৎ, কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। অর্থাৎ, নিজের উপকারের জন্যে যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্ হবে।

এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্‌গণ বলেনঃ যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিবিধ সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পেতো এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীরমত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাযিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরী কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোন ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছেঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তাআলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ এ আয়াত

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ
الْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۚ
أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ۝

(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করা! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্যে কোন বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্যে জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। 'অন্তর গোনাহ্গার' বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা (রাঃ), শা'বী (রাহঃ) ও মুজাহিদ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।— (কুরতুবী)

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, এবাদত ও লেন-দেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ্ তাআলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন ঃ এ গোনাহ্টি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্ণিত শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফযীলতঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত। সীহ্হ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত ইবনে – আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদ্রাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাক্বারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ

ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম ও আলী (রাঃ) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাক্বারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র-সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই— যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

অর্থাৎ, 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বুঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সাঃ) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে-কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন— মুমিনের কাজ হল তা মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিতঃ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

সাহাবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে-কেরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে ঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ, রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন ঃ রসূল (সাঃ)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি সাধারণ মুমিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রসূল (সাঃ)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সাঃ) ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাআলার গ্রন্থাবলী ও সমস্ত পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মুমিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মত আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মুসা (আঃ)-কে এবং খ্রীস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সাঃ)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে-কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে বলেছিলেন ঃ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরের গোপন ধারণার জন্যে দায়ী করা হলে আযাব থেকে কিরূপে বাঁচা যাবে। বলা হয়েছে - لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার ঃ এক ইচ্ছাধীন— যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে

কারও ক্ষতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে — অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি এবং সেজন্যে সওয়াব বা আযাব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরে সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা। অর্থাৎ, অহংকার করা কিংবা মদ্য পানে কৃতসংকল্প হওয়া প্রভৃতি। দুই, অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কু-ধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যেই হবে— অনিচ্ছাধীন কাজের জন্যে নয়।

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে-কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্যে বলা হয়েছেঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থাৎ, মানুষ সওয়াবও সেকাজের জন্যেই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে- কাজের জন্যেই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আযাব হয়। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করে— যা দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎকাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক এ পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ঐ কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে, তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে, যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌঁছায়, যখন সে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসেবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আযাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব।

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।' এরপর বলা হয়েছেঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী-ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।'

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজকর্ম, যা বনী-ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, না-পাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং না-পাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না; যেমন বনী-ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্যে নাযিল করেছে। এসব দোয়া যে আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেছেন, তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত